সার্ধজন্মশতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

অপরাজিত বসু

অবিভক্ত বাংলার যশোর (বর্ত্তমানে খুলনা) জেলার রাড়ুলি-কাটিপারা গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। জায়গাটা কবি মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ নদের অদূরে। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র রায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। হরিশচন্দ্র মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত আরবি, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। হরিশচন্দ্র কিছুকাল চাকরী করার পর বাড়িতে ফিরে এসে বিষয়সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন। রায় পরিবারের বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল। পরে অবশ্য পারিবারিক সম্পদ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাভাবে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

প্রথম দিকে কয়েক বছর গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনার পর প্রফুল্লচন্দ্র পিতামাতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। আমহার্স্ট স্ট্রিটে চাঁপাতলায় তাঁরা বাড়ি ভাড়া করেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। গ্রামে সুস্থ হয়ে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। কেশবচন্দ্র তাঁর ভাই কৃষ্ণবিহারী সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ছিলেন। এখানেই প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৭৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র অ্যালবার্ট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইন্সটিউশনে এফ. এ পড়তে শুরু করেন। এফ এ পাশ করে তিনি ঐ কলেজেই বি এ কোর্সে ভর্তি হন। এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলার -এর বক্তৃতা প্রায়ই শুনতে যেতেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এভাবে শুরু হয়েছিল। বি এ পড়াকালীন প্রফুল্লচন্দ্র গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভের পরীক্ষায় যোগ দেন এবং কৃতকার্য হয়ে তা লাভ করেন। ঐ বৃত্তি অনুযায়ী তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। বিশিষ্ট রসায়ন অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন-এর কাছে প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় Essay on India নামে একটি প্রবন্ধ সকলন প্রফুল্লচন্দ্র প্রকাশ করেন এর মধ্যে India before and after the Mutiny নামে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের উপর ইংরেজের শোষণের ছবি তুলে ধরেছিলেন। তখন থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র মনে - প্রাণে জাতীয়তাবাদী হন। ১৮৮৫ সালে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বছরই ভারতের একমাত্র 'রাজনৈতিকসংগঠন' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর প্রফুল্লচন্দ্র ডি এস সি উপাধি লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। এখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আলেকজান্ডার পেডলার, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখরা। প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত ছাত্রদরদী শিক্ষক ছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মাতৃভাষার ব্যবহার তাঁকে ছাত্রমহলে প্রিয় করে তোলে। মৃত পশুদের হাড় ক্যালসিয়াম ফসফেট ব্যতীত আর কিছু নয় তা দেখাবার জন্য তিনি ক্লাশে গোরুর হাড় দাঁতে কেটে দেখাতেন। ছাত্ররা শিহরিত হত। তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি গড়ে উঠত। অধ্যাপক ছাত্রমহলে প্রিয়পাত্র হতেন।

১৮৯১ সাল নাগাদ প্রফুল্লচন্দ্র একটা রাসায়নিক কারখানা গড়ার উদ্যোগ নেন। ৯১নং আপার সার্কুলার রোডের যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেখানে 'বেঙ্গল কেমিক্যালস ওয়ার্কস' তৈরি হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি নিজে থেকে দিয়েছিলেন। সহযোগী ডাঃ অমূল্যাচরণ বসু তাঁকে আয়ুর্বেদ ঔষধ নির্মাণের সদুপদেশ দেন। এদিকে কলেজে নব্যবিজ্ঞান গবেষণাও প্রফুল্লচন্দ্র শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইস নামে একটা নতুন যোগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই গবেষণাপত্রটি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৯৬)। দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীরা তাঁর এই কাজের প্রশংসা করেন। ক্রমে আরও অনেক নাইট্রাইট শ্রেণীর যৌগ তিনি তিরি করেছিলেন। তাঁকে 'মাস্টার অব নাইট্রাইটস' নামে অভিহিত করা হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসকে আরও বড় করার লক্ষ্যে প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁর সহযোগীরা লিমিটেড কোম্পানি স্থাপন করেন। নতুন কম্পানির নাম হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফারমাসিটিউক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'। বিদেশী ঔষধ, বিদেশী রাসায়নিকের সঙ্গে অসম সংগ্রাম করে বেঙ্গল কেমিক্যাল এগিয়েছে। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের ঝোড়ো দিনগুলি, স্বদেশী আন্দোলন ও শিল্পোদ্যাগের কঠিন দিনগুলিতে অনেক সংগ্রাম করে বেঙ্গল কেমিক্যাল নিজেকে স্থায়ী করেছে, অগ্রগতি ঘটিয়েছে। স্বদেশী জাগরণের একটি আদর্শ হল বেঙ্গল কেমিক্যাল। এটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্থায়ী ফসল।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজের পাশাপাশি প্রফুল্লচন্দ্র পূর্ণ উদ্যমে প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কাজ করে গেছেন। নাইট্রাউট ছাড়া আরও অনেকগুলি অজৈব পদার্থ নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন। কলেজে তিনি একদল ছাত্র গড়েছিলেন যাঁরা পরে বিজ্ঞানে দিকপাল হয়েছিলেন। এঁরা হলেন মেঘনাদ সাহা, প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, নীলরতন ধর, বিমানবিহারী দে, রসিকলাল দত্ত প্রমুখরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরে প্রফুল্লচন্দ্রের এই ছাত্রদল বিজ্ঞানকে কলকাতা থেকে ভারতের বিভিন্ন দিকে নিয়ে যান, সেখানে গবেষণা করেন ও নতুন ছাত্র তৈরি করেন। যেমন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু গেলেন ঢাকায়, নীলরতন ধর ও মেঘনাদ সাহা গেলেন এলাহাবাদে, রামেশচন্দ্র রায় গেলেন পাটনায়, বিমানবিহারী দে গেলেন মাদ্রাজে, অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী গেলেন কটকে, অতুলচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞান রায় গেলেন লাহোরে। এভাবে বাঙ্গালীদের হাত ধরে ভারতীয় রসায়ন তৈরি হল।

একই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থেলার উৎসাহে তিনি প্রাচীন ভারতের রসায়নের ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এর জন্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশের প্রাচীন গ্রন্থাগার গুলিতে সংস্কৃত পুঁথি পড়েন, রসশাস্ত্রগুলি বিচার করেন। চরক, সুশ্রুত, বানভট্টের রচনাও তিনি পাঠ করেন। অতঃপর ১৯০৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র History of Hindu Chemistry-র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন, পরে দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশ করেছিলেন। বইটি বিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চায় একটি

অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। দেশে ও বিদেশে বইটি সমাদর পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল, রসায়নের ইতিহাস চর্চা ও অধ্যাপনা ও রসায়ন চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। ইতিমধ্যে কলেজ থেকে তাঁর অবসরের সময় ঘনিয়ে আসে। ওদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান পাঠের জন্য 'বিজ্ঞান কলেজ' স্থাপন করেছেন। স্যার তারকনাথপালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের আর্থিক দানে বিজ্ঞান কলেজ গড়ে ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। ছাত্রদলকে নিয়ে তিনি স্বয়ং ৯ই আপার সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজে আস্তানা গ্রহণ করেন।

বিদেশের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পর্ক অটুট ছিল। বিজ্ঞান সর্বদাই আন্তর্জাতিক বিষয় তাছাড়া প্রফুল্লচন্দ্র পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সেই সুবাদে তিনি আরও দুবার ইউরোপ থেকে ঘুরে আসেন। এদেশের ছাত্ররা যাতে পাশ্চাত্যে বেশি সংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি করলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকীকরণ হল। ভারতীয় ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় প্যারিস বার্লিন, লন্ডন, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ডে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতীয় রসায়নের আরও বিস্তৃতি হল। গবেষণাপত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর ছাত্ররা ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করলেন (১৯২৪ খ্রিঃ) গবেষণাপত্রিকা প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পর্যালোচনা, গবেষণার অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে সোসাইটি আত্মনিয়োগ করে। বলা বাহুল্য সোসাইটির সভাপতি হলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বেঙ্গল কেমিক্যালকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছিল একটি আদর্শ। সেই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতীয়রা আরও কারখানা গড়ুক—তাই চেয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। স্বদেশী যুগে অনেক শিল্প স্থাপিত হলেও তার সামান্যই স্থায়ী হতে পেরেছিল। মূলধনের সমস্যা, কারিগরি সমস্যা, বাজারের সমস্যার কারণে শিল্পগুলি স্থায়িত্ব পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। বাজারের প্রসার এই সময় ঘটে। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সহযোগী ও ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ক্যালকাটা পটারি, বেঙ্গল এনামেলস, মারকেনটাইল মেরিন, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, আর্যস্থান ইন্সুরেন্স, ভারতী স্কেলস, ন্যাশনাল ট্যানারি, বেঙ্গল সল্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল এবং ভালোই ব্যবসা করতে লাগল।

এসবের বাইরে প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি পরিচয় ছিল। সেটা হল তাঁর উজ্জ্বল সামাজিক সত্তা। সাধারণ মানুষ তাঁকে সব সময় আকর্ষণ করত। বাল্যকাল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র রাঁড়ুলি কাঠিপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন। পরিণত বয়সে ছুটি পেলে গ্রামে আসতেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। 'সঙ্কট ত্রাণ সমিতি' নামে একটা সংগঠন গড়ে প্রফুল্লচন্দ্র মানুষের জন্য কাজ করতেন। বিজ্ঞান কলেজে ত্রাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল। মেঘনাদ সাহা খুলনা, উত্তরবঙ্গও অন্যত্র তাঁর নির্দেশে ত্রাণকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিশের দশকে প্রফুল্লচন্দ্র মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত খাদি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আগে বৃহৎ শিল্পের লক্ষেই তিনি প্রধানত কাজ করেছেন, নিজেই সে কাজে অংশ নিয়েছেন। যত দিন গেল, প্রফুল্লচন্দ্র বুঝলেন, খাদি আন্দোলন সাধারণ মানুষ ও গরীবদের অনেক উপকার করতে পারে। হাতশিল্প, কুটীরশিল্পিপ, খাদি প্রভৃতি দেশীয় পদ্ধতিতে অল্প মূলধনে চলে। চরকা কাটা কাজটা প্রফুল্লচন্দ্র রপ্ত করেন। তিনি দৈনিক নিয়ম করে ছাত্রদের নিয়ে চরকা কাটতেন। চরকাটা কেটে কোন বিধবা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে— এটা তাঁর লক্ষ্যে ছিল। আজকালকার দিনে 'স্বয়ংভর দল' -এর পূর্বস্তর হল এই চরকা, খাদি কর্মোদ্যোগ। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সব দেখে শুনে প্রফুল্লচন্দ্রকে চরকার্যি (চরকা+ঋষি) বলতেন।

ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় ভেদাভেদ, মধ্যবিত্তের প্রতি মোহ, ব্যবসা - বাণিজ্যের প্রতি উদাসীনতা স্বাস্থ্যের অযত্ন প্রভৃতি বিষয়গুলিতে প্রফুল্লচন্দ্র মানুষকে সচেতন করেছেন । এ নিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করতেন। সরাসরি রাজনীতি না করলেও প্রফুল্লচন্দ্রের রাজনীতির প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধুর রাজনৈতিক আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, সর্বোপরি স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়— ''Science can afford wait but Swaraj cannot.''

বাঙালী যুবকদের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বান ছিল ঃ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও, কেরানীর মানসিকতা পরিহার কর, আলস্য ত্যাগ কর, পরিশ্রম কর, জীবিকার জন্য স্বরোজগারী হও। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন (মৃত্যু ১৬ই জুন ১৯৪৪)। এই দীর্ঘজীবন তিনি আধুনিক সমৃদ্ধ স্বাধীন ভারত গড়ার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা উচিত।